Vol. 27 | No. 2 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের ভাষা-চিন্তা

Volume	27
Issue	2
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নরেন বিশ্বাস
Published online	April 1, 1984
DOI	10.62328/Munier.Mufazzal.Anwar.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/Munier.Mufazzal.Anwar.2
Pages	81-90
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের ভাষা-চিন্তা

নরেন বিশ্বাস

"বৈয়াকরণের যে-সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই, শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু; কিন্তু বাংলা ভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি; এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় সাধনে আমি ক্লান্তিবোধ করি না। এই চেষ্টার ফলস্বরূপে ভাষার ভাণ্ডার হইতে যাহা কিছু আহরণ করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে তাহার এটা ওটা সকলকে দেখাইবার জন্য আনিয়া উপস্থিত করি; ইহাতে ব্যাকরণকে চির ঋণে বদ্ধ করিতেছি বলিয়া স্পর্ধা করিব না, ভুলচুক অসম্পূর্ণতাও যথেষ্ট থাকিবে। কিন্তু আমার এই চেষ্টায় কাহারও মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাংলা ভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকার-প্রকার আছে এবং এই আকৃতি-প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টাসকল সার্থক হইবে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিনয় সহকারে যাকে 'বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে তা বাঙলা ভাষাতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে কত অবিস্মরণীয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের মন্তব্যে তার প্রমাণ মেলে। তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন: "But the first Bengali, with a scientific insight to attack the problems of the language was the poet Rabindranath Tagore: and it is flattering for the votaries of Philology to find in one who is the greatest writer in the language, and a great poet and seen for all time, a keen Philologist as well, distinguished alike by an assiduous enquiry into the facts of the language and by a scholarly appreciation of the methods and findings of the western Philologist"।[২] অর্থাৎ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে ভাষা-সমস্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং তাঁর মতে বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠতম লেখক, ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা কবি একজন তীক্ষ্ণধী ভাষাতাত্ত্বিকও ছিলেন।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থ যখন ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়, তারও আগে ১২৯২ থেকে ১৩১১ সন পর্যন্ত বালক, সাধনা, ভারতী, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রবন্ধ-গুলো বের হতে থাকে, তখন ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণনা-বিশ্লেষণ ত দূরের কথা, বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই প্রবীণ পণ্ডিতদের কাছে ছিলো অস্বীকৃত। সংস্কৃত-অনুসারী পণ্ডিতবৃন্দ

সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রের সাহায্যে সর্বক্ষণ শাসনে ব্যাপৃত রাখতেন বাঙলা ভাষাকে, তার ব্যাকরণকে। এবং পুস্তক-পীড়িত এ-সমস্ত পণ্ডিতদের প্রধান প্রবণতা ছিলো যেন—বাঙলাকে যথেষ্টমাত্রায় সংস্কৃত করতে না পারলে জাতে তোলা যাবে না, কুল রক্ষা হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙলা রূপে, স্বরূপে, ধ্বনিতে ও বাগ্‌বিধিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা, এ ভাষা শব্দকল্পদ্রুম বা অমরকোষ অভিধানের আওতাধীন নয়, নয় পাণিনি-ব্যোপদের ব্যাকরণ-শাসিত কোন উপ-ভাষা। তিনি সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব অস্বীকার করেনান কিন্তু বাঙলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে ছিলেন আপোষহীন। তাঁর মতে, "সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয় কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ, তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের বাহ্য উপায়।

অতএব, মানুষের বস্ত্রবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান যেমন একই কথা নহে তেমনই বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ ব্যাকরণ এক নহে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সামান্য কথাটাও প্রকাশ করিতে প্রচুর পরিমাণে বীররসের প্রয়োজন হয়।"[৩] বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ যে আলাদা—একথা প্রকাশ করতে সেদিন সত্যি বীররসের প্রয়োজন ছিলো। রবীন্দ্রনাথের এ-উক্তির সমর্থনে একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ আশা করি অবান্তর হবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি, যার প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৬ সালে যখন "সর্ববিধ রেফাক্রান্ত শব্দে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জনের" বিধান দিলেন তখন শুরু হলো পণ্ডিতদের প্রবল আন্দোলন (যার একজন ছিলেন সুনীতিকুমারের বৃদ্ধ পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায়)।

বাঙলা সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও বলতে বাধ্য হলেন এই বানান-বিধি অবশ্য পালনীয় নয়। যদিও সংস্কৃতে এর বিকল্প ছিলো। অতএব রবীন্দ্রনাথ যখন 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো লিখেছেন—তখন অবস্থা কেমন ছিলো এটা অনুমান করতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ এবং ভাষা-বিষয়ক বক্তব্যের সবচে' বড় বৈশিষ্ট্য হল তা এক-দিকে যেমন তাঁর নিজস্ব প্রতীতিতে উজ্জ্বল, অন্যদিকে তেমনি তার সরস প্রকাশভঙ্গীতে মনোহারী। তাঁর ভাষা-বিষয়ক আলোচনা কখনই 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' নয়, বরঞ্চ 'নীরস তরুবর পুরোতি ভাগি'র মতো দীপ্তিময়। তাঁর মতে সেদিনের প্রচলিত "বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্তিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাম দিয়া মহম্মদ ঘোরী বাবর হুমায়ূনের ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অল্প পরিমাণ ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে; তেমনি আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ থাকে মাত্র।

এরূপ বেনামিতে বিদ্যালাভ ভালো কি মন্দ তাহা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বলিতে সাহস করি না, কিন্তু ইহা যে বেনামি তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"[৪]

কিন্তু আমরা জানি তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' এবং 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধে তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে সাহসী উচ্চারণে ছিলেন অকুতোভয়। তাঁর ভাষার মনোহারী চমৎকারিত্বে ধরা পড়েছে কেবল ভাষার বহিরঙ্গের রূপের বর্ণনা নয়, বরঞ্চ প্রতিটি ভাষাভাষী মানুষের ব্যক্তিমনের ভিতর ভাষা-সম্পর্কিত একটি মৌল নির্মাণ-চেতনার স্বাক্ষর। তিনি পরিচয় দিয়েছেন সেই 'প্রাকৃত বাংলা' বা বাঙলা ভাষার, যা সর্বদাই সজীব ও নিরন্তর রূপান্তরে গতিময় চৈতন্যসত্তারূপে গ্রাহ্য।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অর্থাৎ বৈদিক কালে বেদাঙ্গ হিসেবে ব্যাকরণ ছিলো মূলত ভাষার আকৃতি, ধ্বনি ও রূপের ব্যবহার-বৈচিত্র্যের বিধিমালার বর্ণনা। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীও বর্ণনামূলক ব্যাকরণ। শব্দার্থতত্ত্ব সে-যুগে 'নিরুক্ত' বেদাঙ্গে আলোচিত হতো। ধ্বনি-তত্ত্বের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিলো 'শিক্ষা' শাস্ত্রে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আধুনিককালের পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রানুসারে যথার্থই ভাষাতাত্ত্বিক বা ভাষাবিজ্ঞানী অভিধার যোগ্য। কারণ তিনি তাঁর ভাষাবিষয়ক আলোচনায় প্রচলিত ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা দ্বারা আক্রান্ত নন আদৌ, বরঞ্চ আধুনিক ভাষাতত্ত্বের উন্মুক্ত বাতাবরণে তিনি তুলে ধরেছেন ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব এবং শব্দার্থতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য। ভাষার এই রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যেখানে তিনি সিদ্ধান্তে পেঁ ৌছেছেন---সেখানে তাঁর মৌলিকতা তর্কাতীতভাবে দীপ্র। রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য ছিল সেই ভাষা যে-ভাষা সৃষ্টিধর্মী, যে-ভাষা কেবল বস্তুকে রূপ দেয় না, কল্পনাকে মূর্ত করতে সক্ষম। সুতরাং তাঁর আলোচনা কেবল ধ্বনিতত্ত্বাশ্রয়ী হয়ে ওঠেনি কখনই, প্রজ্ঞা এবং অনুভূতির প্রকাশ-প্রতীক হিসেবে তিনি ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। কুন্তকের 'বক্রোক্তি জীবিতে'র মতো ভাষার সৃজনধর্মী 'বক্রতার' ইঙ্গিতময়তাকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়: "আবার আমাদের ভাষারও মধ্যে সুর এবং ইশারা স্থান লাভ করিয়াছে। অর্থবিশিষ্ট শব্দের সাহায্যে যে-সকল কথা বুঝিতে দেরি হয় বা বুঝা যায় না, তাহাদের জন্য ভাষা বহুতর ইঙ্গিত-বাক্যের আশ্রয় লইয়াছে। এই ইঙ্গিত-বাক্যগুলি অভিধান ব্যাকরণের বাহিরে বাস করে, কিন্তু কাজের বেলা ইহাদিগকে লইয়া চলে না। বাংলা ভাষায় এই ইঙ্গিত-বাক্যের ব্যবহার যত বেশি, এমন আর কোনো ভাষায় আছে বলিয়া আমরা জানি না।"[৫]

রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষার নিজস্ব শব্দাবলীর চারিত্র, পদরূপের বৈশিষ্ট্য, বাগ্‌বিধির সুনিপুণ সংকেতময়তা অর্থাৎ রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব এবং কাব্যতত্ত্বসহ ভাষার গতি-প্রকৃতির সার্বিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হন। তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'বাংলা উচ্চারণ'। এটি ১২৯২ আশ্বিন সংখ্যায় 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে ইংরেজী ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে বাঙলা উচ্চারণের যে তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন, তা সত্যি বিস্ময়কর। এবং আজকের বাংলাদেশে বাঙলাভাষী

শিক্ষিত মানুষের কাছে তাঁর বক্তব্য একাধিক কারণে স্মর্তব্য। তিনি ইংরেজী বর্ণমালার একই অক্ষরের বিভিন্ন উচ্চারণ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "অনেক কষ্টে যখন বিএ=বি, সিএ=কে মুখস্থ হইয়াছে, তখন শুনা গেল, বিএবি=ব্যাব্, সিএবি=ক্যাব্। তাও যখন মুখস্থ হইল তখন শুনি বিএআর=বার্, সিএআর=কার্। তাও যদিবা আয়ত্ত হইল তখন শুনি বিএডব্লএল্=বল্, সিএডব্লএল্=কল্। এই অকূল বানান-পাথারের মধ্যে গুরু মহাশয় যে আমাদের কর্ণ ধরিয়া চালনা করেন, তাঁহার কম্পাসই বা কোথায়, তাঁহার ধ্রুবতারাই বা কোথায়।"৬

এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন লেখায় অক্ষর আছে অথচ তার উচ্চারণ নেই এমন সমস্ত ইংরেজী শব্দের। এবং এ-প্রসঙ্গে বাদ যায়নি ইংরেজী ছাব্বিশটি অক্ষরের সমাচার। তিনি রসময় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন ইংরেজী ফার্স্ট বুকের কথা।

"আইন ইংরেজ রাজ্যের সর্বত্র আছে (রক্ষা হউক আর নাই হউক) কিন্তু ইংরেজের ফার্স্ট বুক-এ নাই। যখন বর্গির উপদ্রব ছিল তখন বর্গির ভয় দেখাইয়া ছেলেদের ঘুম পাড়াইত—কিন্তু ছেলেদের পক্ষে বর্গির অপেক্ষা ইংরেজি ছাব্বিশটা অক্ষর যে বেশি ভয়ানক, সে-বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইতে পারে না। ঘুম পাড়ানী গান নিম্নলিখিত মতে বদল করিলে সংগত হয়, ইহাতে আজকালকার বাঙালি ছেলেও ঘুমাইবে, বর্গির ছেলেও ঘুমাইবে :

ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল
    ফার্স্ট বুক এল দেশে—
বানান-ভুলে মাথা খেয়েছে
    একজামিন দেবো কিসে।৭

ইংরেজী ভাষার প্রতি কোনো বীতরাগ থেকে রবীন্দ্রনাথ একথা উচ্চারণ করেননি—স্বভাষার সমস্যা অন্বেষণে প্রসঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করেছেন মাত্র। ইংলন্ডে বসে এক ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াতে গিয়ে তিনি প্রথম বাঙলা ভাষার উচ্চারণ বিশৃংখলা লক্ষ্য করেই এর একটা সূত্র সন্ধানে ব্রতী হন। আর এতে তাঁর প্রথমেই নজর পড়ে স্বরধ্বনি অ-এর উচ্চারণ মাঝে মাঝে ও কিংবা ও-কারান্ত হয়ে যায়---অতি, কলু, ঘড়ি, মরু, দক্ষ ইত্যাদি। এবং তিনি লক্ষ্য করলেন কেবল স্থানবিশেষে 'অ' 'ও' হচ্ছে। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে ৮টি নিয়মের উল্লেখ করলেন।

(১) ই (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অথবা উ (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) কিংবা ই-কারান্ত উ-কারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে তার পূর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ 'ও' হবে; যথা, অগ্নি, অগ্নিন, কপি, তরু, অঙ্গুলি, অধুনা, হনু ইত্যাদি।

(২) য-ফলা বিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে 'অ' 'ও' হবে। যেমন-গণ্য, লভ্য, পদ্য, গদ্য, অদ্য ইত্যাদি। অবশ্য এ-নিয়মকে তিনি প্রথম সূত্রের আওতাধীন বলে ব্যাখ্যা

করলেন। কারণ য-ফলা মূল 'ই' এবং 'আ'এর যোগমাত্র। এজন্যে সংস্কৃতে কিংবা ব্রজবুলিতে এখনো উচ্চারিত হয় শূন্য>শূনিয়ো ; আষাঢ়স্য>আষাঢ়সিয়।

(৩) 'ক্ষ' পরে থাকলে 'অ' 'ও' হবে। যেমন-কক্ষ, লক্ষ, পক্ষ, দক্ষ, বক্ষ ইত্যাদি। কিন্তু তিনি শুধু সূত্র নির্দেশ করেই ক্ষান্ত নন, ব্যাখ্যার বিশিষ্টতায়, কারণ অনুসন্ধানের একাগ্রতায় ঈর্ষণীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন--ক্ষ-র উচ্চারণ বোধ করি এককালে কতকটা ই-কার ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। এবং আমরাও জানি এখনও ময়মনসিংহ কিংবা ঢাকার বহুলোকে লক্ষ টাকাকে বলে থাকেন লৈক্ষ্য টাকা।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এ-সমস্ত নিয়মের আবিষ্কারক নন কেবল, তিনি ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে কোথাও বিধান প্রদান করেই দায়িত্ব শেষ করেননি। এ-নিয়ম কেন করা হচ্ছে, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি কি, এটা কতখানি বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিনিষ্ঠ, এর ব্যতিক্রম আছে কিনা সে-সম্পর্কেও সত্য উদ্‌ঘাটনে কুণ্ঠিত হননি কোথাও। যেমন উল্লিখিত সূত্রের ব্যতিক্রম নির্দেশে তিনি বললেন—"ইউ য ফলা ঋ ক্ষ পরে থাকিলেও অভাবার্থসূচক অ এর বিকার হয় না, যথা, অকিঞ্চন, অকুতোভয়, অখ্যাতি, অমৃত, অক্ষয়।" এরপর তিনি আদ্যক্ষর 'এ' স্বরবর্ণের দু'রকম উচ্চারণ একটি সহজ 'এ' আর একটি বাঁকা 'অ্যা'-এর উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আমরা লিখি 'এক' কিন্তু পড়ি 'এ্যাক' এবং 'একুশ' লিখিও পড়িও। এরপর তিনি কেবল আদ্যক্ষর নিয়ে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি ; টা, টো, টে এ-বিভক্তি রূপের উচ্চারণ বিষয়েও আমাদের সচেতন করেছেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরেছেন এ-সূত্রের আওতাধীন বিভিন্ন ক্রিয়াপদ ও শব্দের উচ্চারণ।

তিনি আত্ম-অনুসন্ধানে আবিষ্কার করছেন, 'ই এবং উ স্বরবর্ণ বাংলার বহুসংখ্যক উচ্চারণ বিকারের মূলীভূত কারণ।' সে অথবা এ শব্দের পরে টা বিভক্তি অবিকৃত থাকে ; যেমন, এটা, সেটা। কিন্তু 'সেই' 'এই' শব্দের টা বিভক্তির বিকার জন্যে, যেমন, এইটে, সেইটে। অতএব দেখা গেল ই-কারের পর 'টা' 'টে' হয়ে যাচ্ছে। তিনি এ-থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন—ই-কারের পরবর্তী আকার মাত্রের প্রতিই এই নিয়ম প্রয়োগ করে দেখা কর্তব্য।

হইয়া—হয়ে	হিসাব—হিসেব	লইয়া—লয়ে
সাহিনা—সাইনে	পিঠা—পিঠে	ভিক্ষা—ভিক্ষে
চিঁড়া—চিঁড়ে	শিক্ষা—শিক্ষে	শিকা—শিকে
বিলাত—বিলেত	বিনা—বিনে	পিনা—পিনে ইত্যাদি।

এবং তিনি এ-সূত্রের আলোকে বিশ্লেষণ করলেন যেখানে অপভ্রংশে মূল শব্দের ই-কার লুপ্ত হয়ে যায়, সেখানেও এ-নিয়ম বলবৎ থাকে। যেমন—করিয়া>ক'রে, মরিচা>মর্চে, সরিষা>সর্ষে ইত্যাদি।

পূর্বে ই থাকলে যেমন পরবর্তী আ এ হয়ে যায় তেমনই আগে উ থাকলে পরের আ ও হয়ে যায়—তিনি এটা লক্ষ্য করে সংগ্রহ করলেন যে-উদাহরণ তা নিঃসন্দেহে একান্তভাবে চলিত, বাঙলার তাঁর ভাষায় প্রাকৃত বাঙলার—ফুটা >ফুটো, মুঠা>মুঠো, কুলা >কুলো, চুলা>চুলো, কুয়া >কুয়ো, চুমা >চুমো। তিনি দেখালেন ঔ-কারের বেলায়ও এ-নিয়ম প্রযোজ্য, কারণ ঔ=অ+উ মিশ্রিত যুক্তস্বর। সুতরাং এ-কারণেই নৌকা> নৌকো, কৌটা >কৌটো হয়ে যায় অবলীলাক্রমে। ব্যাকরণের স্বরসঙ্গতির বিধানকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ধ্বনি-পরিবর্তনের যে সউদাহরণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আধুনিককালের ভাষাপ্রেমী মানুষের কাছেও বিপুল বিস্ময়ের বিষয়।

বাঙলা বর্ণমালার ঙ এবং ঞ-কে রবীন্দ্রনাথ আখ্যায়িত করেছেন 'বেকার বর্ণ' বলে, কারণ যুক্তবর্ণ ব্যতিরেকে এদের স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই। ঙ তবু রঙ, রাঙা, ভাঙা, বাঙলার মধ্য দিয়ে আজকাল একটা স্থান করে নিয়েছে, কিন্তু ঞ-এর বেকারত্বের অভিশাপ আজ পর্যন্ত অটুট। তিনি বাঙলা উচ্চারণের ভিত্তিতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—ব, ষ, স এবং ণ এদের অনাবশ্যকতা সম্পর্কে এবং সেদিনও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি ক্ষ বর্ণের উচ্চারণ বিভ্রান্তিরবি ষয়ে।

বাঙলা বানান প্রসঙ্গে তিনিই যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩৭-এর ১২ই জুনে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা চিঠিতে: "বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার জন্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম। তার কারণ এই যে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার সাহিত্যে অবাধে প্রচলিত হয়ে চলেছে কিন্তু এর বানান সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে দেখে চিন্তিত হয়েছিলুম। এ-সম্বন্ধে আমার আচরণেও উচ্ছৃংখলতা প্রকাশ পায় যে আমি জানি, এবং তার জন্যে আমি প্রশ্রয় দাবি করিনে। এ-রকম অব্যবস্থা দূর করার একমাত্র উপায় শিক্ষা বিভাগের প্রধান নিয়ন্তাদের হাতে বানান সম্বন্ধে শাসনের ভার সমর্পণ করা।"[৮] এবং ২৯শে জুন আরেক চিঠিতে তিনি জানান : "···প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয়নি, কেননা আজো তার প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারেনি। কিন্তু এই বানানের ভিৎ পাকা করার কাজ শুরু করবার সময় এসেছে।···এই কারণে সুনীতিকে এই ভার নেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেম।"[৯]

এবং তিনি এ-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থে তাঁর কালাতিক্রমী উচ্চারণ আজো স্মর্তব্য : "বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমনকি কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখন সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে হয়েছে আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেইটেই পড়ি বাংলা ভাষায়।"[১০] 'শব্দতত্ত্ব'-যুগ থেকে 'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থের কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ঈ-এর পরিবর্তে হ্রস্ব ই-র প্রতি আসক্তি প্রকাশ পেয়েছে নানা লেখায়, কারণ তাঁর মতে একমাত্র সর্বনাম কী ব্যতিরেকে প্রাকৃত বাংলায় আর কোথাও দীর্ঘ ঈ-কার নেই।

এ-জন্যেই তিনি সংস্কৃত নীচ শব্দের বানানেও হ্রস্ব ই-কার দিয়ে 'নিচ' লিখতেন। এবং এ-সূত্র ধরেই ইংরেজি, মুসলমানি শব্দে হ্রস্ব ই-কার ব্যবহার করেছেন অসংকোচে।

'সংস্কৃত ব্যাকরণে সমস্ত শব্দেরই একটা মূল ধাতু আন্দাজ করা হয়েছে'। রবীন্দ্রনাথ এ-তত্ত্বকে অস্বীকার করেননি। তিনি ভাষার ক্রমবিকাশে জীববিজ্ঞানের ন্যায়কেও উল্লেখ করেছেন মাঝে মধ্যে কিন্তু তাঁর প্রধান লক্ষ্য মানুষের ভাষার প্রতীক ধর্ম, যে-জন্যে জীবজগতের অন্যান্য পশুপাখীর ডাকের থেকে সে-ভাষা স্বতন্ত্র। "দোয়েল কোকিলেরাও ধ্বনি দিয়ে ভাব প্রকাশ করে। মানুষের ভাষার ধ্বনি তেমন সহজ নয়"। এ-সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর মতে—"ভাষাকে তাল রেখে চলতে হয় মনের সঙ্গে। সে-মনের গতিতো চোখের দেখার সীমানার মধ্যে সংকীর্ণ নয়। যাদের দেখা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, কেবল মাত্র ভাবা যায়, মানুষের সবচেয়ে বড়ো দেনা-পাওনা তাদেরই নিয়ে।'[১১] এ-প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ যখন 'শব্দতত্ত্বে'র প্রবন্ধগুলো লিখেছেন তখন তিনি প্রাকৃত বাংলার আদি-আলোচক।

কিন্তু ১৯২৬ সালে সুনীতিকুমারের বিপুল আয়তনের দু'খণ্ডে বিভক্ত The Origin and Development of Bengali Language বের হওয়ারও একযুগ পরে কেন 'বাংলা-ভাষা পরিচয়' গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে আগ্রহী হলেন? আসলে সুনীতিকুমারের পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়তো ওই বিপুল আয়তনের গ্রন্থটিতে তাঁর ভাষা ভাবনাজাত প্রত্যাশার পূরণ হয়নি। কারণ 'ভাষাচার্য' সুনীতিকুমারের উক্ত গ্রন্থে ভাষা বিশ্লেষণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি মূলত ধ্বনিতত্ত্বানুসারী। ধ্বনিবিবর্তনের ফলে কিভাবে ভাষার পুরানো রূপের পরিবর্তনে নোতুন রূপ গড়ে ওঠে তার সুনিপুণ বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু সেখানে গুরুত্ব পায়নি Semantics বা শব্দার্থতত্ত্ব এবং Syntax বা পদান্বয়রীতির সহযোগে ভাষার সেই ইঙ্গিতময় লাবণ্যে ভঙ্গিওয়ালা বাংলা ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁদটা। 'বাংলা-ভাষা পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি (ছাত্র-পাঠকের প্রতি) বলেছেন—"ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাৎ এই—তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোল-বিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে চলাপথের ভ্রমণকারী। নানাদেশের শব্দমহলের, এমনকি তার প্রেতলোকের হাট-হদ্দ জানেন তিনি, প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে। চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে-ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি বকে যাব।"[১২]

অর্থাৎ সুনীতিকুমারের গ্রন্থে কেবল 'প্রেতলোকের হাট-হদ্দ' নয়, ভাষা শরীরের ধ্বনি-রূপ কঙ্কালেরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ আছে। আর রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় কেবল ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব নয়, চলিত বাঙলা ভাষার অখণ্ড জীবনসত্তা যা অনেক সময়েই প্রতীকাশ্রয়ী, কল্পনানির্ভর। এক অর্থে তিনি ভাষার বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করেননি সর্বত্র, দর্শন বিচার করেছেন প্রধানত। আর এ-প্রসঙ্গে বাঙলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তাঁর

মন্তব্য হচ্ছে : "বাগ্‌যন্ত্রের একটা কিছু সূক্ষ্মভেদ আছে, তাতেই উচ্চারণের গড়ন যায় বদলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুখে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণের মিশ্রণ ঘটবার রাস্তায় তফাত দেখতে পাওয়া যায়। তারপর তাদের চিন্তার আছে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ, তাতে শব্দ জোড়বার ধরন ও ভাষার প্রকৃতি আলাদা করে দেয়। ভাষা প্রথমে আরম্ভ হয় নানারকম দৈবাৎ শব্দ সংঘাতে, তারপরে মানুষের দেহমনের স্বভাব অনুসরণ করে সেইসব সংকেতের ধারায় সে ভরে উঠতে থাকে।"১৩ আর সংকেত ধারার বা ইঙ্গিতময়তার দিক তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছিল প্রায় তিন দশক আগে থেকে অর্থাৎ 'শব্দতত্ত্বের' যুগে। যখন তিনি লিখেছিলেন বাংলা শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ভাষার ইঙ্গিত এবং বাংলা ব্যাকরণের মতো প্রবন্ধাবলী।

তিনি বাঙলা ভাষার শব্দদ্বৈতের প্রাচুর্য এবং বিধিবৈচিত্র্যে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছেন এগুলো সাধারণত : (১) পুনরাবৃত্তিবাচক, যেমন—মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, পরে পরে, পায় পায়, পথে পথে, ঘরে ঘরে, হাড়ে হাড়ে, কথায় কথায় ; (২) পরস্পর সংযোগবাচক—বুকে বুকে, মুখে মুখে, চোখে চোখে, কাঠে কাঠে, পাথরে পাথরে ; (৩) নিয়তবর্তিতাবাচক—সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে পাশে, মনে মনে, তলে তলে, পেটে পেটে ; (৪) দীর্ঘকালীনতাবাচক—চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে ; (৫) বিভক্তিবহুলতা-বাচক—অন্য অন্য, অনেক অনেক, নূতন নূতন, ঘন ঘন, টুকরা টুকরা, লাল লাল, কালো কালো, আশায় আশায়, ভয়ে ভয়ে ; (৬) প্রকর্ষবাচক—টাটকা টাটকা, গরম গরম, ঠিক ঠিক, গলায় গলায়, কানে কানে, জ্বল জ্বল, চুর চুর, ঘুর ঘুর। এবং এরপরে তিনি লক্ষ্য করেছেন অনেকগুলো শব্দদ্বৈত আবার ব্যক্ত করে দ্বিধা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতার ভাব—যেমন, যাব যাব, উঠি উঠি, মেঘ মেঘ, জ্বর জ্বর, শীত শীত, পড়ো পড়ো, ফাঁকা ফাঁকা, ভিজে ভিজে, ভাসা ভাসা, কাঁদো কাঁদো ইত্যাদি। তিনি আলোচনার অন্তিমে উল্লেখ করলেন অনির্দিষ্ট প্রভৃতিবাচক শব্দদ্বৈতের—জল-টল, পয়সা-টয়সা। অর্থাৎ জল-টল বললে জলের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক জিনিষ অনুপস্থিত থাকেনা। এবং এ-সূত্রের সরণীতে এসে হাজির হল—বোঁচকা-বুঁচকি, দড়া-দড়ি, গোলা-গুলি, গুঁড়া-গাঁড়া, কাপড়-চোপড়ও। ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"বাংলা ভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ এক-শ্রেণীর শব্দবিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই। অথচ সে সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গ-ভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে।"১৪ এরপর তিনি স্বরবর্ণ আ থেকে অর্থাৎ আইঢাই আঁকুপাঁকু আনচান আমতা আমতা থেকে শুরু করে হ'র হুড়োমুড়িতে গিয়ে থেমেছেন। এ-দীর্ঘ তালিকা প্রণয়নের পেছনে কারণ ছিলো এই যে, তাঁর মতে বাঙলা ভাষায় সকল প্রকার ইন্দ্রিয়বোধই অধিকাংশস্থলে শ্রুতিগম্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হয়ে থাকে। যেমন গতির দ্রুততা প্রধানত চোখে দেখার ব্যাপার কিন্তু যখন বলা হয় ধাঁ করে, বোঁ করে ভোঁ করে তীর প্রভৃতি জিনিশ চলে যায় তখন এই অর্থহীন ধ্বনিকে আশ্রয় করে শ্রোতার কল্পনা চকিতে মুক্তিলাভ্ করে। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে তাঁর এই স্বভাব-অনুসন্ধিৎসা আমাদেরকে উপহার দিয়েছে আরো অভাবিত ধ্বন্যাত্মক

শব্দরাজি-- যেখানে উচ্চারিত ধ্বনির সাথে ভাবের কোনো দূর সম্পর্কও নেই বাঙলা ভাষায়, সেখানেও এ অর্থহীন ধ্বনিগুচ্ছ সৃষ্টি করে অপূর্ব ব্যঞ্জনা—যেমন, কনকনে শীত। মাটির সাথে শরীরের যে-সম্পর্ক সেটা সুস্পষ্ট হয় যখন আমরা বলি, গা মাটি মাটি করছে। কেবল বস্তু নয় শূন্যতা, স্তব্ধতা, এমনকি নিঃশব্দতাকেও ভাষারূপ দিতে শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে, মাঠ ধূ ধূ করে, জল থৈ থৈ করে, শূন্য হৃদয় হু হু করে ওঠে। বর্ণ বা রঙকেও রাঙিয়ে তোলে ধ্বন্যাত্মক শব্দ—টুকটুকে লাল, ধবধবে শাদা, মিসমিসে কালো ইত্যাদি। এবং এভাবে আলোচনা করে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মেছে যে—''আমাদের বোধশক্তি যে শব্দার্থ জালে ধরা দিতে চায় না, বাংলা ভাষা তাকে সেই অর্থের বন্ধন থেকে ছাড়া দিতে কুণ্ঠিত হয়নি, আভিধানিক শাসনকে লংঘন করে সে বোবার প্রকাশ-প্রণালীকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছে।''১৫

কেবল শব্দদ্বৈত কিংবা ধ্বন্যাত্মক শব্দ নয়, তিনি বাঙলা ভাষার প্রত্যয়, সর্বনাম, অব্যয় এবং ক্রিয়া-বিভক্তি কারকেরও এমন বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন যাতে তাঁর ভাষায় 'ভঙ্গীওয়ালা' বাঙলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য সুচিত হয়, অন্তর্নিহিত ভঙ্গীময়তা চমৎকৃত করে। প্রত্যয় প্রসঙ্গে তাঁর স্মর্তব্য উক্তি হচ্ছে: এ প্রত্যয়গুলোর কোনো কোনোটা অর্থগত ব্যবহার অতিক্রম করে অতিরিক্ত ইঙ্গিতের দিকে পৌঁছোচ্ছে। যেমন—কিপটেমো, জ্যাঠামো, বিটলেমো, বাঁদরামো, বোকামো, মাৎলামো। কিন্তু ঐ 'মো' বা 'আমো' প্রত্যয় যোগে—'বাঁদরামো' হলেও 'সিংহমো' হয় না। 'কিপটেমো' জায়েজ কিন্তু 'দাতামো' হবে না। এ-জন্যে তিনি এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ''একটা প্রত্যয় দিয়ে বিশেষ করে মনের ঝাল মেটাবার উপায় বোধ করি আর কোনো ভাষাতেই নেই।''১৬

বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায়-সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং এর কারক-বিভক্তির সংখ্যাও সংস্কৃতের সমান সংখ্যক—প্রচলিত এই ধারণার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে লিখেছেন: ''সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদান কারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়, তবে এ-কথাই বা কেন না বলা যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে। ...'তাহাকে দিলাম' যদি সম্প্রদান কারকের কোঠায় পড়ে, তবে তাহাকে মারিলাম 'সন্তাড়ন কারক', ছেলেকে কোলে লইলাম 'সংলালনকারক', সন্দেশ খাইলাম 'সম্ভোজন কারক', মাথা নাড়িলাম 'সঞ্চালন কারক' এবং এক বাংলা কর্ম কারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে।''১৭

বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর আলোচনার সারাৎসার হচ্ছে: ''আমাদের বাঙালি কেহ যদি মাথায় হ্যাট, পায়ে বুট, গলায় কলার এবং সর্বাঙ্গে বিলাতি পোষাক পরেন, তবু তাঁহার রঙে এবং দেহের ছাঁচে কুললক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভাষার সেই প্রকৃতি-গত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ। বাংলায় সংস্কৃত শব্দ কটা আছে, তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে চেনা যায় না, কিন্তু কোন বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে

বিশেষরূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কী ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষাবীক্ষণে এই ছাঁচের অনুসন্ধান করেছেন এবং এ-জন্যেই তিনি ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের অভিধায় 'বাক্‌পতি' রবীন্দ্রনাথ।

তথ্যনির্দেশ

১ রবীন্দ্র রচনাবলী : দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, "ভাষার ইঙ্গিত", পৃ. ৪০৯-১০

২ The Origin and Development of Bengali Language, Suniti Kumar Chatterji, Preface XVI

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

৬ প্রাগুক্ত, 'বাংলা উচ্চারণ', পৃ. ৩৩৭

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

৮ বাংলা বানান : মনীন্দ্রকুমার ঘোষ, পৃ. ১৩-১৪

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলাভাষা পরিচয়, পৃ. ১২

১১ রবীন্দ্র রচনাবলী, ষড়্‌বিংশ খণ্ড, বাংলাভাষা পরিচয়, পৃ. ৩৭৮

১২ প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ৩৭১

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

১৪ রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ', পৃ. ৩৭৪

১৫ রবীন্দ্র রচনাবলী, ষড়্‌বিংশ খণ্ড, পৃ. ৪৫১

১৬ রবীন্দ্র রচনাবলী, ষড়্‌বিংশ খণ্ড, পৃ. ৪২৪

১৭ রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, শব্দতত্ত্ব (পরিশিষ্ট, বাংলা ব্যাকরণ), পৃ. ৫৬৬-৬৭

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯